# পাঁচমিশেলি

মানিক দাস

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

## নিবেদন

গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক **সময় প্রবাহে** সাপ্তাহিক কলমে এই লেখাগুলো বেরিয়েছিল। নিয়মিত বেরোনোর সময় পাঠক মহলে বেশ সাড়া পড়ে। তখন অনেকে অনুরোধ করেন লেখাগুলো গ্রন্থভুক্ত করতে। তাঁদের আগ্রহ আর অলক মজুমদারের উৎসাহের জন্যই এ-বই প্রকাশিত হতে পারল। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ **সময় প্রবাহের** সম্পাদক সুকুমার বাগচীর কাছেও। তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয় আর আগ্রহের ফলেই 'পাঁচমিশেলি' লেখা সম্ভব হয়েছিল। একজনের নাম এখানে অযুক্ত রইল। তিনি তাই চান। অথচ এ-বই প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকাই মুখ্য। তাঁকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

লেখক

উল্টোরথ
১৪০৪ বঙ্গাব্দ
গুয়াহাটি-৫

# সূচি


| | |
|---|---|
| চিকিৎসা-ব্যবসা | ৯ |
| মেধা বিভ্রাট | ১২ |
| বৈধ-ধর্ষণ | ১৫ |
| প্রেম নেই | ১৮ |
| জন্ম-শাসন | ২১ |
| গুরুকৃপা | ২৪ |
| জীবন-তৃষ্ণা | ২৭ |
| শিশু-গুণ্ডা | ৩০ |
| রূপ নিয়ে | ৩৩ |
| রত্ন-মাহাত্ম্য | ৩৬ |
| এক ছোট্ট মেয়েকে | ৩৯ |
| সুখ-দুঃখ | ৪২ |
| আমাদের ওরা | ৪৫ |
| মার্কেট ইকনমি | ৪৭ |
| খেলনাপাতি | ৫০ |
| যথাযোগ্যতা | ৫৩ |
| শহরে চলো | ৫৬ |
| উদাসীন জীবনযাপন | ৫৯ |
| মুক্তি-চাই | ৬২ |
| দুর্নীতির উত্তরাধিকার | ৬৫ |
| শিশু-ভোলানাথ | ৬৮ |
| আমাকে দেখুন | ৭১ |
| পতি পরমেশ্বর | ৭৪ |
| খণ্ড-দৃষ্টি | ৭৭ |
| বিজ্ঞাপন-বিভ্রম | ৮০ |
| প্রসঙ্গ দেশভাগ | ৮২ |
| দুঃস্বপ্নের মন্তাজ | ৮৫ |
| পিতৃতান্ত্রিকতা | ৮৮ |
| সমন্বয়-চিন্তা | ৯১ |
| ঈর্ষার স্বরূপ | ৯৪ |

# চিকিৎসা-ব্যবসা

এককালে ডাক্তাররা ছিলেন ভগবানের মতো। ভক্ত ভগবানের দেখা পান না কোনোদিন, তাঁকে ডাকাই সার, কিন্তু ডাক্তার ছিলেন, তাঁকে ডাকলে পাওয়া যেত। তিনি কাছে এসে দাঁড়ালে রোগীর আত্মীয়স্বজনরা ভরসা পেতেন। মৃত্যুপথযাত্রী কোনো রোগীকে পরীক্ষা করে তিনি যখন ম্লান মুখে বলতেন, "ভয়ের কিছু নেই, ওষুধ লিখে দিচ্ছি, সেরে যাবে" তখন অভিভাবকরা সে-কথা শুনে প্রায় লুটিয়ে পড়তে চাইতেন তাঁর চরণে। "আপনি সাক্ষাৎ ভগবান" মনে মনে বলতেন তাঁরা বা পরে আলোচনা করতেন। তখন ওষুধ ছিল কম, আন্তরিকতা আর সেবার মনোভাব ছিল বেশি। চিকিৎসা বিভ্রাটে কম হতো, অত্যধিক ওষুধ বা ভুল ওষুধ খেয়ে এক রোগ থেকে আরেক রোগে পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা থাকতো ক্ষীণ।

ইদানীং অবস্থা পাল্টেছে, যুগ-সঙ্কটের যাবতীয় লক্ষণ এখন ডাক্তারদের মধ্যে ফুটে উঠেছে। শুধু ডাক্তারদের মধ্যে বললে ভুল হবে, বলতে হবে সমস্ত চিকিৎসা জগতে। ডাক্তারি এখন পেশা—অর্থকরী বিদ্যা। সেবা নয়। সেবা এখন গৌণ, আসল লক্ষ্য অর্থোপার্জন। এর জন্য যত নিচে নামা যায়, যত নির্মম হওয়া যায় ততই ডাক্তারের মঙ্গল। ডাক্তার এখন রোগীর ভালোর জন্য হাজির নন, হাজির নিজের ভালোর জন্য। রোগ বাড়লে, চারদিকে মড়ক দেখা দিলে ডাক্তার উৎফুল্ল হন। কারণ পয়সা আসবে। পয়সা আসবে শুধু রোগীর কাছ থেকে নয়, আসবে নার্সিংহোম থেকে, আসবে ওষুধ কোম্পানি থেকে, আসবে ফিজিসিয়ানস স্যাম্পল বেচে।

বাজারে এখন অনেক ওষুধ। যেখানে শ দেড়েক ওষুধ হলেই যাবতীয় অসুখের চিকিৎসা করা চলে সেখানে নাকি হাজার ত্রিশেক ওষুধ ছড়ানো হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানি ছাড়াও আছে ছোট-বড় নানা ওষুধ কোম্পানি। সেই সঙ্গে প্রায়শ যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কোম্পানি। তাদের প্রত্যেকের অনেক ওষুধ। এই ওষুধ চালানোর জন্য নিয়োগ করা হয়েছে চিকিৎসা-প্রতিনিধি। প্রত্যেককে স্যুট-টাই পরিয়ে, হাতে ব্যাগ ধরিয়ে, বেঁধে দেওয়া হচ্ছে টার্গেট—এত লক্ষ টাকার ব্যবসা তাঁকে গুছিয়ে দিতে হবে। চাকরি বাঁচাতে, উন্নতির সিঁড়িতে পা রাখার মানসে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন ভিন্ন পথে হাঁটতে। ডাক্তার ব্যস্ত, মেডিক্যাল জার্নাল পড়ে শিক্ষিত হওয়ার মতো সময় তাঁর নেই। তাই তাঁকে শিক্ষিত করার দায় নিতে হয়, চিকিৎসা-প্রতিনিধিকে। তিনি পাঁচ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণে ফোল্ডার দেখিয়ে বুঝিয়ে দেন নতুন কোন ড্রাগ বাজারে তাঁদের কোম্পানি এনেছে এবং কেন সেটা সর্বোৎকৃষ্ট। সব বুঝে ডাক্তার বলেন, সব ঠিক আছে। কিন্তু এই ড্রাগ চালালে আমার কী লাভ?

চিকিৎসা-প্রতিনিধি হাসেন। বলেন, কী চাই আপনার? ডাক্তার জানান—মারুতি কারের দুটো চাকা চাই। আলাদিনের গল্পের সেই দৈত্যের মতো তিনি বলেন, তথাস্তু।

আর হ্যাঁ, এরপর থেকে ডাক্তার এলোপাথাড়ি সেই ওষুধ তাঁর প্রতিটি রোগীর প্রেসক্রিপশনে লিখে যান। রোগীর তা প্রয়োজন আছে কি না তা আর জানার দরকার পড়ে না তাঁর। তিনি জানতেও পারবেন না সে ওষুধ কী ধরনের প্রতিক্রিয়া রোগীদের শরীরে ঘটিয়েছে।

এইভাবে বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে ওষুধ ব্যবসায়ীরা ডাক্তারদের মারফত ওষুধ বিক্রি করে চলেছে। হাজার হাজার ফার্মাসিতে হাজার হাজার ওষুধ মজুত আছে। সেগুলো নাড়াচাড়া করে অর্ধ-শিক্ষিত কর্মচারীরা। ওষুধ নাড়াচাড়া করতে করতে তারাও প্রায় ডাক্তার হয়ে ওঠে। ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে তারাই নানা অসুখ-বিসুখের ওষুধ দিয়ে দেয় নির্বিবাদে। চন্দন বনে থাকলে এড়েণ্ডা গাছেও চন্দনের গন্ধ পাওয়া যায়। তেমনি ডাক্তার আর ওষুধের সংস্পর্শে থেকে তারাও ডাক্তারবৎ হয়ে যায়। সাধারণ রোগীরা তাদের পছন্দ করেন। কারণ তাদের ভিজিট দিতে হয় না, পায়খানা-পেচ্ছাব পরীক্ষা করানোর ঝামেলায় যেতে হয় না। অথচ একথা শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে সমস্ত ওষুধই বলতে গেলে বিষ। উল্টোপাল্টা ওষুধ খেলে ভালোর চেয়ে মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এক বিপত্তি থেকে আরেক বিপত্তি হতে পারে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? কে বোঝায় কাকে?

প্রসঙ্গত ভিজিট-এর কথা আসে। আজকাল তা প্রায় নিয়মের পর্যায়ে চলে গেছে যে, রোগী যত বার ডাক্তারের কাছে যাবেন ততবার ভিজিট দেবেন। সে ভিজিটও আবার মোটা অঙ্কের। তাছাড়া, যে-কোনো অসুখ হলেই পাঁচ রকমের পরীক্ষার নির্দেশ দেন ডাক্তার। এর পেছনে রোগটা ভালোভাবে জানার চেয়ে কমিশনের মোটিভটা বেশি সক্রিয়। তিনি স্পষ্টত তাঁর দিকটাই দেখেন, রোগীর সামর্থ্যের কথা ভাবেন না।

প্রচার মাহাত্ম্য এমন যে, অনেক সময় ওষুধ বাজারে আসার আগেই ডাক্তার "প্রেসক্রাইব" করতে শুরু করে দেন। দিন কয়েক আগে একজন লোক তাঁর চোখে ছোট্ট ফোঁড়া জাতীয় কিছু একটা হওয়ায় এক বেশ-নাম-করা চোখের ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন, ডাক্তার দেখে-টেখে এমন এক ওষুধের নাম লিখে দেন যে সেই ভদ্রলোক সারা শহর তছনছ করেও সেটি জোগাড় করতে পারলেন না। ফার্মাসিতে সবাই বলেন নতুন ওষুধ, সবে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, বাজারে ছাড়া হয়নি এখনও। এ কথা বিশ্বাস করে তিনি ফের সেই ডাক্তারের কাছে গেলেন। তাঁর বক্তব্য শোনার পর গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্তার বললেন, ওষুধ নেই কে বলেছে? আমার কাছে আছে, এঁর দাম বাজারে ষাট টাকা। আমি আপনাকে অর্ধেক দামে দেবো।

ভদ্রলোক বুদ্ধিমান। তিনি ওষুধ নেননি। দুটো কারণে। প্রথম কারণ ডাক্তারের চালাকি আর দ্বিতীয় কারণ গিনিপিগ হবার ইচ্ছে তাঁর নেই। নতুন ওষুধ, ডাক্তার সবে নমুনা (sample file) পেয়েছেন। প্রয়োগ করে ফলাফল জানতে পারেননি। তা জানার জন্যই তিনি গিনিপিগ করতে চাইছেন তাঁকে—এই সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়াতে তিনি ডাক্তারবাবুর অর্থমূল্যে দুর্মূল্য ওষুধ ব্যবহার করা থেকে বিরত রইলেন। কয়েকদিন পর দেখা গেল তাঁর অসুখটা আপনাআপনি সেরে গেছে।

খবরের কাগজে প্রায়ই খবর থাকে যে ভেজাল ওষুধ খেয়ে এতজনের মৃত্যু। অপরিশোধিত জল দিয়ে তৈরি স্যালাইন বিক্রি হচ্ছে অবাধে। নকল চিকিৎসক ধৃত। লাইসেন্সবিহীন ওষুধ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার ইত্যাদি। এসব খবর প্রতিটিই আতঙ্কজনক। চিকিৎসা জগতে কী পরিমাণ দুর্নীতি আর অসাধুতা জাঁকিয়ে বসেছে তা এসব খবর বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়।

চিকিৎসকদের কনজিউমার্স অ্যাক্টের আওতায় আনার কথা হয়েছিল মাঝখানে। শোনা মাত্র ডাক্তাররা হৈ চৈ বাধিয়ে তুললেন। কেন? না এতে তাঁদের স্বার্থহানি ঘটবে, পয়সা কামানোতে বিপত্তি ঘটাবে। খুশিমতো দোহন করা যাবে না দরিদ্র-নিরক্ষর অসহায় রোগীদের। শুধু কি তাই? অনেক ডাক্তার কোনো সৎ হৃদয়বান এবং সেবাপরায়ণ ডাক্তারকে পশার জমালে দেখতে রুষ্ট হন। গাত্রদাহ হয়। শেষে তা এমন পর্যায়ে যায় যে তাঁরা নানা উপায় অবলম্বন করে সেই ডাক্তারকে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করেন নয়তো সমাজবিরোধীদের দিয়ে নিষেধ জারি করান এই বলে যে, তিনি নিজের বাড়িতে রোগী দেখতে পারবেন না। আর চেম্বারে বা হাসপাতালেও নির্দিষ্টসংখ্যক রোগী ছাড়া অতিরিক্ত রোগী দেখা বারণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগীরা যাতে উপায় না পেয়ে অন্য ডাক্তারের কাছে ছুটতে বাধ্য হন তার ব্যবস্থা করা।

হ্যাঁ, চিকিৎসা জগতের সামগ্রিক অবস্থাটা সংক্ষেপে এই যে নার্সিংহোম-হাসপাতালের কেচ্ছার কথা আর তোলা হলো না। অনেক পরিসর দরকার। তাছাড়া পাঠকরা তো এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। অবস্থাটা নিঃসন্দেহে ভীতিপ্রদ এবং চূড়ান্তভাবে হতাশাজনক। সবার মনে এখন এক প্রশ্ন ঃ এর থেকে বাঁচার পথ কী? উত্তরটা বোধহয় কারও জানা নেই। তবে অনেকে বলেন, গোটা সমাজটাতেই পচন ধরেছে। চিকিৎসা জগতের এই পচন সমাজের সামগ্রিক পচনেরই অঙ্গ। অতএব পুরো সমাজটাকে না-পাল্টাতে পারলে চিকিৎসা জগতের পচন ঠেকানো যাবে না।

কিন্তু সমাজ পাল্টাবে কে? কোথায় সেই লোক? নেই। নেই বলেই ডাক্তাররা আস্কারা পাচ্ছেন। নির্ভয়ে দাপট দেখিয়ে যাচ্ছেন। বাস্তিল ভাঙার পণ নিয়ে কেউ না-আসা পর্যন্ত এই দাপট চলতেই থাকবে। চলতেই থাকবে।

# মেধা-বিভ্রাট

প্রতি বছর স্কুল ফাইনাল যারা দেয় তাদের মধ্য থেকে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে অসাধারণ ফল দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। তাদের সম্পর্কে লেখা হয় বিস্তর। কাগজে কাগজে ছবি বেরোয়। সাক্ষাৎকার, বিশেষ পরিচিতি বা প্রশংসাসূচক লেখা ছাপা হয় পত্র-পত্রিকায়। তারা বাপ-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে। ধন্য ধন্য করে চারপাশের লোকজন।

এরা মেধাবী ছাত্রছাত্রী। এরা প্রতি বছর প্রতি রাজ্য থেকে বেরোয়। সংখ্যায় এরা নেহাত কম নয়। কিন্তু এরা পরবর্তীকালে কোথায় যায়? এরা কি উত্তরোত্তর উন্নতি করে? শেষপর্যন্ত কি এরা শিখর চূড়ায় গিয়ে ওঠে? এদের কৃতিত্বের খবর আর কেন শোনা যায় না? নাকি তাদের কৃতিত্ব স্কুল ফাইনালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? এটা একটা ধাঁধা। এ-ধাঁধার সঠিক জবাব কেউই দিতে পারবে না।

এই মেধাবী ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলা হয় শৈশব থেকেই। শৈশব থেকেই এদের গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় থাকেন অভিভাবক আত্মীয়স্বজন গৃহশিক্ষক থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা পর্যন্ত। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টার ফসল উক্ত মেধাবী ছেলেমেয়েরা। যখন কারো শৈশবে লক্ষ্য করা যায় যে সে পড়ায় ভালো তখন থেকেই শুরু হয় তৎপরতা। পরীক্ষায় ভালো ফল করাতেই হবে। অতএব শৈশব থেকেই তাকে জাগতিক সমস্ত কিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে "আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ" এই গুপ্তমন্ত্র কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যাতে সে বিপথগামী না হয়।

এই মেধাবীদের নিয়ে প্রত্যেকেরই অনেক প্রত্যাশা। অভিভাবকরা ভাবেন তাঁদের ছেলে বা মেয়েকে ভবিষ্যতে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। তাঁদের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে তারা। আত্মীয়স্বজনরা ভাবেন এরা তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে তুলবে। গৃহশিক্ষক ভাবেন এর ফল ভালো হলে তাঁর মান বাড়বে, চড়বে চাহিদা। আর বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ভাবেন এর রেজাল্ট ভালো হওয়া মানে স্কুলের সুনাম, শিক্ষকদের কৃতিত্ব।

এইভাবে একজন মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রীকে ঘিরে যে-প্রত্যাশার চক্র গড়ে ওঠে তার যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে হয় তাকে। সে একটাই মন্ত্র জানে কেবল—পড়-পড়-পড়। না হলে সর্বনাশ। সে সর্বনাশ ঠেকাতে তাকে অহোরাত্র পরিশ্রম করতে হয়। জীবন থেকে বিদেয় করতে হয় তার সব সহজ-স্বাভাবিক কৃত্য।

মেধাবী সন্তান মানে সোনার টুকরো ছেলে বা মেয়ে। অসাধারণ প্রতিভাবানের শিরোপা তাকে দেওয়া। কত না আদিখ্যেতা তাকে নিয়ে। গর্বে অহংকারে স্ফীত বক্ষ প্রত্যেকের। সে-গর্বের সংক্রমণ ঘটে মেধাবী ছাত্রটির মধ্যেও। সে নিজেকে আর পাঁচজন থেকে স্বতন্ত্র ভাবতে শুরু করে। সরিয়ে নেয় নিজেকে। হয়ে পড়ে আত্মমগ্ন।

অভিভাবক আত্মীয়স্বজনদের আদিখ্যেতা যেমন-তেমন, তা সহ্য করা যায়, বোঝাও যায় তার কার্যকারণ। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আদিখ্যেতা অসহনীয়। তাকে কিছুতেই সহজভাবে নেওয়া যায় না। তাঁরা সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সমান চোখে দেখা বাদ দিয়ে উক্ত মেধাবীটিকে নিয়ে পড়েন। প্রয়োজনাধিক শ্রম ও নিষ্ঠা ব্যয় করেন। তাকে কোথায় রাখেন কী করেন ভেবে পান না। যেন মাথায় রাখলে উকুনে খাবে আর মাটিতে রাখলে পিঁপড়ের পেটে যাবে। সমদর্শী শিক্ষকও হয়ে পড়েন বেসামাল। হয়তো ভাবেন, সবাই সমান বটে তবে কেউ কেউ বেশি সমান। ফলে অন্যান্য সহপাঠীরা করুণা পায়, ধিকৃত হয় 'অমুকের' মতো মেধাবী না হওয়ার জন্য। কিন্তু নানা কারণে সবাই যে মেধাবী হতে পারে না, হওয়া সম্ভবও নয় বা সবাই মেধাবী হলে অন্যরকমের বিপদও আছে কিংবা পূর্ণবিকশিত মানুষ হবার জন্য মেধাবী না হলেও চলে—এসব কথা তাঁরা বিচার করতে ভুলে যান তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের অল্প মোহেই।

চারদিকে এখন মেধার জয়গান। মেধাবীদের কদর। নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার যুগে অন্যকে ডিঙিয়ে যাওয়াই আদর্শ। সে আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে হবে। পরীক্ষায় বেশি বেশি নম্বর পেতে হবে। বেশি নম্বর পেলেই মেধাবী। আর তাই শৈশব থেকেই শুরু হয় বেশি নম্বর পাবার প্রতিযোগিতা—ইঁদুর দৌড়। মেধা এখন তৈরি করা যায়। টাকা ঢেলে, তথাকথিত ভালো স্কুলে পড়িয়ে, প্রতি বিষয়ের জন্য নামীদামি গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করে, দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় পড়ার ঘরে বন্দী করে রেখে, ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রী তৈরি করা হচ্ছে। এদের সামনে কোনো মহৎ আদর্শ নেই, জীবনদর্শন নেই, আছে শুধু অভিভাবকদের ইচ্ছে পূরণের দায়।

কৃত্রিম মেধাবী তৈরি করার পেছনে থাকে প্রত্যেক অভিভাবকের মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা—এক কথায় যাকে বলে লোভ। সন্তানকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাতে হবে। কেন? সমাজসেবা বা দেশোদ্ধার করার জন্য? না, অর্থোপার্জনের জন্য। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের এখন রমরমা ব্যবসা। তাদের দলে ভিড়তে হবে। টাকা চাই, টাকা। সন্তান এখন টাকা কামাইয়ের অস্ত্র। অন্য কিছু নয়।

টাকাটাই এখন মুখ্য। আর টাকাটাই যেখানে মুখ্য সেখানে মহৎ আদর্শের প্রশ্ন আসতে পারে না। মূল্যবোধ পাল্টাতে বাধ্য। ফলে ডাক্তার হবার জন্য যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে লম্বা লাইন লাগায় মেডিক্যাল কলেজে তাদের সামনে টাকাটাই একমাত্র আকর্ষণ। সেবার মনোবৃত্তি থাকে না কোথাও। টাকার টানেই তারা ডাক্তার হতে যাচ্ছে, অন্য কোনো ভাবাদর্শের টানে নয়। ফলে ডাক্তার হয়ে তারা রোগীর জীবন-মৃত্যু নিয়ে খেলা করে নির্বিকার চিত্তে, টাকা পেলে মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচায়, টাকা না পেলে বেঁচে থাকা রোগীকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না। একই অবস্থা দাঁড়ায় ইঞ্জিনিয়ারদের বেলায়ও।

অভিভাবকদের যার যে-দিকে দুর্বলতা তাঁরা তাঁদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের সেদিকে ভিড়িয়ে দিচ্ছেন। ছেলে-মেয়েদের সেদিকে আগ্রহ থাকুক ছাই না-ই থাকুক। এর দরুন দেখা যাচ্ছে যার সুদক্ষ ক্যামেরাম্যান বা আলোকচিত্রী হবার কথা ছিল সে হয়েছে রোগী-মারা ডাক্তার। যার আদর্শ অধ্যাপক হবার কথা বা বাসনা ছিল সে হয়েছে দুর্নীতিপরায়ণ ইঞ্জিনিয়ার। আবার যার ডাক্তার হবার কথা ছিল বা মানুষকে রোগমুক্ত করার স্বপ্ন দেখত সে হয়েছে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। যার হওয়ার কথা ছিল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সে হয়েছে ব্যাঙ্কের করণিক ইত্যাদি। এইভাবে